বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

একটি জাতির জন্ম

ফেব্রুয়ারির (১৯৭১) শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িগুলোয় জমা করছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুলসংখ্যায় তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে।

এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ংকর রকমের অশুভ একটা কিছু করবে, তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এলো ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকে আরো গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের নিরাপত্তা এনসিওরা আমাকে জানালো বিংশতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে চড়ে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতিরাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায়। নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এ সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিদের হাসপাতালে ভর্তি হতে শোনা যায়।

এই সময় আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানযুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পকে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং নিরস্ত্র করার উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা এবং বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব কর্নেল (তখন মেজর) শওকত আমার কাছে জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই, তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায়, কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনলাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ ঘুরাব। সম্ভবত ৪ মার্চ আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে থাকি।

'৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো।' আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি এবং পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধু সঙ্গে আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য

আমদানি করতে লাগল। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারসিনে আসা-যাওয়া শুরু করলো । চট্টগ্রামে নৌবাহিনীতে শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দুই দিন পর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকেও পরিকল্পনাভুক্ত করলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

২১ মার্চ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বেলুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমিকে বললেন, 'ফাতমি, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কমসংখ্যক লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে।' আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকায় চলে গেলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটল তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক থেকে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরের দিন আমরা পথের ব্যারিকেড সরাতে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর এলো সেই কালরাত।

২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালরাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলেন নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সঙ্গে নৌবাহিনীর পাকিস্তানি প্রহরি থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আমার তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সঙ্গে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কি না তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে আমার প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারি। হয়তোবা আমাকে চিরকালের জন্যই স্বাগত জানাবে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এ সময় সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে তারা হত্যা করেছে। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি বললাম আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি বাহিনী অফিসার নৌবাহিনীর চিফ পোর্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে আমাদের আর বন্দরে যাবার দরকার নেই। এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভার কে গাড়ি ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো যে, সে আমার আদেশ মানল। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোল, আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম।

নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানল এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ডুকে পরলাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে

টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। সে আমার সঙ্গে হাত মেলাল।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখি, সব পাকিস্তানি অফিসারকে বন্ধি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট এম আর চৌধুরীর সঙ্গে আর মেজর রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ করলাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সঙ্গেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসারজেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানত। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিল। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্তের অক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনো দিন ভুলবে না, কো-ন দি-ন না।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপি
প্রধান কার্যালয়
২৮ ভিআইপি রোড, নয়া পল্টন
ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ
চেয়ারপারসন কার্যালয়
হাউজ নম্বর: ৬, রোড: ৮৬,
গুলশান-২, ঢাকা ১২১২
বাংলাদেশ